চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস

ইংরেজিতে স্ট্রিম অফ কনসাসনেসের (stream of conciousness) বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে চেতনাপ্রবাহ। চেতনাপ্রবাহ জিনিসটা কী সেটা ভালো করে বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। আমরা দেখেছি নদীতে জলস্রোত বয়ে যায়, সমুদ্রে একটির পর একটি ঢেউ ওঠে। নদীর যে জলস্রোত একবার চলে যায়, তা আর ফেরে না, সেই জলস্রোতের জায়গা নেয় নতুন জলস্রোত। সমুদ্রেও তেমনিই একটিমাত্র ঢেউ উঠেই থেমে যায় না। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসতেই থাকে। মানুষের মনের চিন্তাকে এই সমুদ্রের ঢেউ বা নদীর জলস্রোতের সঙ্গে তুলনা করতে পারি আমরা। আমাদের মনেও সারাক্ষণই নিত্যনতুন ভাবনা খেলা করে যেতে থাকে, এবং আমরা ক্রমাগত একটি চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় চলে যেতে থাকি। এই যে অনর্গল চিন্তার ধারা, একেই বলা হয় চেতনার প্রবাহ। এখন যে উপন্যাসে এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে, মানুষের মনের অভ্যন্তরে চলতে থাকে ক্রমিক চিন্তার ধারাকে লেখার বিষয় করা হয়, তাকে আমরা চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস বলতে পারি।

ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকেই চেতনা প্রবাহ নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছিল। বিশেষত ফ্রয়েডের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সাহিত্যিক এবং সমালোচকদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল। ১৯১৫ সালে ডরোথি রিচার্ডসন 'পয়েন্ডেট রুফস' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ সমালোচক মে সিনক্লেয়ার

ডরোথির এই উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনার সময়ে প্রথমবার চেতনা প্রবাহের কথা উল্লেখ করেন। জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' এই ধারার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বাংলায় চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাসের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' উপন্যাস উল্লেখযোগ্য।

বৈশিষ্ট্য:

১। মানুষের মনের অন্তর্জগতের নানা জটিল টানাপোড়েনই এই ধরনের উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

২। এই ধরনের উপন্যাসে প্রায় কোনো প্লট থাকে না। যেহেতু মনের জটিলতা এবং ভাবনার স্রোত এখানে বিষয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার ছক এখানে গড়ে উঠতে পারে না।

৩। মানুষের মনের বহু বিচিত্র এবং অসম্ভব চিন্তা, যা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে, তা এই ধরনের উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়।

৪। মনের চিন্তাকে প্রকাশ করার জন্য তিনটে শিল্পরীতিকে ব্যবহার করা হয়। এক, স্বগতোক্তি। দুই, সর্বজ্ঞ কথকের বিবরণ। তিন, অন্তর্ভাষন।

৫। এই ধরনের উপন্যাসে কোনো কালগত ধারাবাহিকতা থাকে না। মনের চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে উপন্যাস কখনো অতীত, কখনো বর্তমান, কখনো বা ভবিষ্যতে ছুটে বেড়ায়।

৬। কালের মতো উপন্যাসে কোনো স্থানগত ঐক্যও দেখতে পাওয়া যায় না। কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গার বদলে বহু জায়গার বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

৭। চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাসে ভাষা খুব জরুরি একটি উপাদান। মনের জটিলতা প্রকাশের জন্য লেখকেরা বিবিধ কাব্যিক এবং অসংলগ্ন বাক্যের ব্যবহার করতে থাকেন। অনেক লেখক বাক্যের মধ্যে জ্যোতিচিহ্ন বর্জন করেন। অনেক সময় বাক্যগুলো শেষ হয় না, অর্ধেক বিবৃতি দিয়েই থমকে যায়।

একটি উদাহরণ:

বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস হল সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী। ১৯৪২ সালের ভারত-ছাড়ো অন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপন্যাসটি লিখিত। পূর্ণিয়া জেলার একটি বাঙালি পরিবার এই উপন্যাসের কেন্দ্রে। পরিবারের চারজন সদস্য, বাবা-মা এবং দুই ভাই। এই চারজনই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু আদর্শগত মতান্তরের কারণে তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন। ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাবা-মা এবং বড় ভাইকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে ঢোকায়। শুধু তাই নয় বড়ো ভাইয়ের ফাঁসির শাস্তি ঘোষিত হয়। এই উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে সেই ফাঁসির আগের রাতের গল্প। রাজবন্দীর কক্ষে থাকা বাবা, মহিলাদের কক্ষে থাকা মা, ফাঁসির কুঠরীতে থাকা বড় ভাই, এবং জেলখানার বাইরে বসে থাকা ছোটোভাই, সারারাত ধরে কী ভাবছে সেসব কথাই উপন্যাসে পরপর বলে যাওয়া হয়। স্বাভাবিক যে সেসব ভাবনার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। অজস্র স্মৃতি এবং ঘটনার ঢেউতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সেখানে গুলিয়ে গেছে। মনের অলিগলিতে ঘুরতে ঘুরতে প্রকট হয়েছে আত্মভাষন এবং অন্তর্মুখীনতা। উপন্যাসের শেষে বড়ো ভাইয়ের ফাঁসি হয়নি, কিন্তু একটি রাত্রির মধ্যে দিয়ে যেভাবে চারটি মানুষের মন, মেজাজ এবং অন্তর্জগতের চালচিত্রকে বাঙময় করে তোলা হয়েছে, তাতে জাগরীকে চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস বলাই যায়।

বাংলা...